ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 743-751
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.285

দীনেশচন্দ্র সেনের রাখালকথা: কোথা গেলে প্রেম পাই?

ড. পারমিতা ব্যানার্জী মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Dineshchandra Sen had taken the opportunity to present the Lord Krishna with His two prominent identities – Lover Krishna & Ruler Krishna in his two fictional writings 'Muktachuri' and 'Rakhaler Rajgi'. In 'Muktachuri', Krishna is the God of Love; He has come to spread the spirit of love in the world. On the other hand, in 'Rakhaler Rajgi', Krishna is the ideal king, who has not forgotten the power and necessity of love for living. Dineshchandra is biased on the identity of Krishna, as the ideal Lover. So, after being the King, Krishna, in 'Rakhaler Rajgi', preferred the Bamboo Flute inspite of Sword or Crown. Without any hesitation, Krishna can speak to Brinda Duti, not to be afraid from Him; till now the leg-dust of Radha is more precious than the royal crown. Now-a-days, the spirit of love is decreasing and the spirit of power is increasing incredibly. This is not a good sign for our civilization. Keeping it in mind, Dineshchandra Sen, wished that the spirit of Lover Krishna should be more valuable to us. Love only can produce more and more 'Mukta' (The Pearl), by which the society will be more livable. Simultaneously, spirit of showing power should be abolished, so that relations become more precious day by day. The idea of Dineshchandra, we think very important and should be practised with great care.

Keywords: Dineshchandra Sen, Muktachuri, Rakhaler Rajgi, Politics, Past and Present, Power and Love

বর্তমান কালে ভারতের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা মনে হয় অতি রাজনীতির সংকট। রাজনীতির সর্বভুক মানসিকতায় যেন লুপ্ত হতে বসেছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় জীবন। অথচ ভারতের অতীত ঐতিহ্য ছিল সম্পূর্ণত ভিন্ন। পৌরাণিক কাহিনি-মতে, কংসের অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ মানুষ তখন মর্ত্যে আবির্ভূত হন নররূপী নারায়ণ। কিন্তু শুধু কংসকে হত্যা করে তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠাই করেননি, তার আগে বিস্তার ঘটিয়েছেন প্রেমলীলার। ঐশ্বর্যলীলাতেও তাঁর সেই প্রেমলীলা নতুন মোড় নিয়েছে। সেই জনজীবনসংলগ্ন কাহিনিকে খুবই জনবোধ্য ভাষায় দীনেশচন্দ্র রূপদান করেছেন 'মুক্তাচুরি' ও 'রাখালের রাজগি' রচনায়। বর্তমানকালে আমরা দেখছি 'রাজগি' বা রাজ-পদের লড়াই। কিন্তু সেই রাখাল কোথায় যে প্রেমের বাতাবরণে মানবের মুক্তির পথ দেখাবে– এই প্রশ্নের সাপেক্ষেই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ প্রয়াস।

দুই...

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যে মূলত পরিচিত ইতিহাস আলোচক, লোক-সংগ্রাহক ও সম্পাদক রূপে। সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারের গ্রন্থে মূলত এই তিনটি পরিচয়ই আমরা পেয়ে থাকি। এর বাইরে তাঁর যে আরও একটি বিশেষ পরিচয় আছে সেদিকে খুব একটা আলোচনা চোখে পড়ে না। তিনি বাংলার জনপ্রিয় কীর্তনগান অবলম্বন করে কৃষ্ণকথাকে খুবই সরল, সাবলীল ভাষায় প্রায় লোকসাহিত্যের রূপদান করেছেন। তাঁর কথায়–

> "কীর্ত্তনের পদাবলী থেকে সংগ্রহ করা ভাবগুলি নিয়ে আমি যে বইগুলি লিখেছি, তাদের সম্বন্ধে মৌলিকতার দাবী আমি করি না।"[১]

তিনি বিনয়ের সঙ্গে একথা বলেছেন। কিন্তু, আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, কী ভাষায়, কী ভাবে, কী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সেই সৃজনকর্ম এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক আবেদনে পরিপূর্ণ। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরতে পারি শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিমত:

> "আমার বিবেচনায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই প্রকার আখ্যান দ্বারা আমাদের সাহিত্যের একটী নূতন ধারা প্রদর্শিত হইয়াছে– এই ধারায় বঙ্গ-সাহিত্য প্রাচীন নির্ম্মল রসসৃষ্টি দ্বারা এক নূতন আনন্দের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি নব্য শিক্ষিত-সমাজের সগৌরব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্যে যে অস্বাভাবিক বৈদেশিক ভাব-বাহুল্য ঘটনাচক্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য অনেক পরিমাণে অপসারিত হইবে।"[২]

দীনেশচন্দ্র সেনের সেই সাহিত্যসাধনার অমূল্য দুই রত্নফল 'মুক্তাচুরি' ও 'রাখালের রাজগি'। এই দুটি রচনা বর্তমান কালের নিরিখেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের আলোচনায় সেই তাৎপর্যের দিকগুলি তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

'মুক্তাচুরি' গ্রন্থের 'অবতরণিকা' অংশে দীনেশচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন যে, একসময় শিক্ষিত সম্প্রদায় কীর্তন গানকে খুবই অবহেলা করতেন। সেই অবহেলা যে কি ভয়ানক ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত–

> "এ দেশের কোন বিশিষ্ট সমাজ খোলের উপর এতটা বিরক্ত ছিল যে তাঁদের প্রার্থনা-মন্দিরের আঙ্গিনায় কেউ খোল আন্‌তে পারবেন না, দলিলপত্রে এইরূপ একটি সর্ত্ত লিখে রেজেষ্টারী করেছিলেন।"[৩]

তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এইজন্য যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কীর্তনের অনুরাগী হয়ে এই বিষয়ে বিশিষ্ট সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সূত্রেই দীনেশচন্দ্র সেকালের বিখ্যাত কথক ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির কথকতা, শিবু কীর্তনিয়ার কীর্তনগান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই তিনি কীর্তনের রসে অবগাহন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিটি স্মরণযোগ্য–

> "আমি শিশুকাল থেকে অনেক কীর্ত্তনীয়ার গান শুনেছি। ধূলট উপলক্ষে নবদ্বীপে গিয়ে বঙ্গের কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে যাঁরা চূড়া, তাঁদের রস-নির্ঝরের বিন্দু আস্বাদন করে এসেছি।"[৪]

তাঁর মতে বাংলাদেশের (অখণ্ড) মসলিন, নব্যন্যায়, ফজলী আম আর কীর্তন– এই চারটি জিনিস হল স্বতন্ত্র সম্পদ তথা গৌরব এবং সর্বপ্রধান গৌরব হল কীর্তন। বাঙালির মনে-প্রাণে যে কীর্তন জড়িত হয়ে আছে

তাকে কোনোভাবেই হেলাফেলা করা উচিত নয় বলে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যেও এক পরামর্শ বা উপদেশ দিয়েছেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই' যে বাংলাদেশে সেখানে জন্মে, সেই জল-মাটি-হাওয়া আত্মস্থ করে বড়ো হয়ে তার সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করেই সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েও তিনি ভুলে যাননি মাটির গন্ধ, দেশীয় সংস্কৃতি, দেশীয় লোকাচার। সেই দিক থেকে বাংলার বর্তমান কালের 'নামে বাঙালি' মানুষের কাছে এই রচনাগুলির আবেদন যথেষ্ট।

তিন...

'মুক্তাচুরি' রচনার আখ্যানভাগ অতি সামান্যই। কৃষ্ণের সখা সুদামের ইচ্ছে জাগে সে গোরুগুলিকে মুক্তার মালা দিয়ে সাজাবে। কৃষ্ণ একটি মুক্তা পেলে হাজার হাজার মুক্তা ফলাতে পারে। কিন্তু সেই একটি মুক্তা কোথায় পাওয়া যায়? সখা বসুদাম মুক্তার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতার কথা জানায়। তার মায়ের মুক্তার কানের দুলের একটাতে হাত দেওয়ায় তার মা ক্ষুব্ধ হয়; জানায় সেগুলি খুব দামী জিনিস। দামী জিনিস, স্বভাবতই তা পাওয়া খুব মুশকিল। সখা শ্রীদাম একটা উপায় বাতলায়। রাজার মেয়ে রাধার কাছে সহজেই মুক্তা পাওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণ চাইলে সে কি আর একটা মুক্তা দেবে না? কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সুদাম একটি মুক্তা আনতে গেল রাধার কাছে। কিন্তু রাধা এই সুযোগে কৃষ্ণকে কাছে পেতে গিয়ে রাখাল বলে গালিগালাজ ও রাখালদের বোধবুদ্ধি প্রসঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে বসল। ফলত কৃষ্ণ মায়ের কাছ থেকে আদর-অভিমানের জোরে মুক্তা আদায় করল, হাজারে হাজারে মুক্তা ফলিয়ে গোরুদের মুক্তার মালা দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা করল। রাধাকে জব্দ করার জন্য গেল না কুঞ্জে। বিরহী রাধা সখী মারফত সব জানতে পারল। ক্রমে রাধার গোপন অভিসার কিন্তু ব্যর্থতা, দুর্দশা, কৃষ্ণের রাধা-অদর্শনজনিত কাতরতা, কৃষ্ণের মানভাঙানো ও মিলন।

এই কাহিনির উৎস সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, 'রাধাতন্ত্র'–এর কথা। সেখান থেকেই তিনি কৃষ্ণের সাত সখা ও রাধার সাত সখীর নাম সংগ্রহ করেছেন:

- ❖ কৃষ্ণের সখা– বসুদাম, সুদাম, শ্রীদাম, অংশুমান, মধুকণ্ঠ, মন্দার ও মধুমঙ্গল।
- ❖ রাধার সখী– ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী।

এই বন্ধু-পরিবৃত গ্রামজীবনের কথা পড়তে পড়তে আমরা হারিয়ে যাই যেন এক স্বপ্নকল্প জগতে। অথচ এই জগত বেশিদিন যে হারিয়েছে তা নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশে থাকাকালীন ভারত থেকে, বাংলা থেকে গ্রামজীবনের এই সামন্বয়িক চেহারা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বর্তমান বিশ্বায়নের পণ্যসর্বস্ব বেচাকেনার জগতে অবস্থা আরও ভয়ানক। কে কার হৃদয়ের খবর রাখে? বর্তমানকালে মান ভাঙানোর সময় কোথায়?

চার...

'মুক্তাচুরি'-তে বৃন্দাবনলীলা বা মধুরলীলা। আর 'রাখালের রাজগি' কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার কাহিনি। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:

> "'রাজগি' কি? এই প্রশ্ন অনেকের মুখে আমায় শুনতে হয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গে ও হিন্দুস্থানে এ কথাটি খুবই প্রচলিত, ইহার অর্থ রাজ-পদ। 'রাখালের রাজগি' অর্থ রাখালের রাজ-পদ। কেউ কেউ প্রশ্ন কল্লেন, 'রাখালের রাজ-পদ' লিখ্‌লেন না কেন? উত্তরে এই বল্‌ব, বাঙ্গালা

ভাষাটার দোর-জানেলা কষে বেঁধে ফেলা উচিত নয়। পূর্ব্ববঙ্গে যদি কোন শব্দ-সম্পদ থাকে –তা কি আট্‌কে রাখতে হবে? সাহিত্যের আসরে তা স্থান পাবে না?"[৫]

দীনেশচন্দ্রের আজীবনের সাধনা তো তাই-ই ছিল; লোকসাহিত্যকে, লোকভাষাকে, লোকবিশ্বাসকে, লোকসংস্কৃতিকে মর্যাদা প্রদান করা। তাই 'রাখালের রাজগি' রচনায় আমরা যে কৃষ্ণকে পাই সেই কৃষ্ণ স্বর্গের নয়, ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীর রাখাল বালক। সে হাতের কাছের রাখাল একদিন মথুরার রাজা হল। ছেড়ে চলে গেল মধুরলীলার বৃন্দাবন। সেই দুঃখে-বিরহে মা যশোদা, পিতা নন্দ, কৃষ্ণের সখা ও রাধার সখীরা, সর্বোপরি রাধা অস্থির হতে থাকে। কৃষ্ণ, তাদের কানু কি আর ফিরে আসবে না বৃন্দাবনে ? সবার দূতী হয়ে বৃন্দা গেল মথুরায় কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনতে। সেখানে গিয়ে সে প্রত্যক্ষ করল রাজকীয় ঐশ্বর্য। সমস্ত বাধা পেরিয়ে যখন সে পৌঁছল কৃষ্ণের কাছে তখন কৃষ্ণের আনন্দ যেন বিশ্বপ্লাবী হয়ে উঠল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সেই মুহূর্তে কৃষ্ণের উক্তি–

"তুমি আমায় দেখে ভয় পেও না। এই দেখ রাজদণ্ড, কত হীরার গাঁথুনী; যমদণ্ডের ন্যায় লোকে এ দেখে ভয় পায়। কিন্তু আমার বাঁশীটি বৃন্দাবনে ফেলে এসেছি। যে হাতে বাঁশী ছিল, সে হাতে কি এই রাজদণ্ড সাজে! আমার ময়ূর পাখা নেই, এই রাজমুকুটে কি আমার সে সাধ মিটবে! সেই যে রাধার পায়ের ধুলো যার শিরোভূষণ, সে ময়ূরপুচ্ছের মূল্য কি এই রাজমুকুটের?"[৬]

বৈষ্ণব দর্শনমতে রাধা, ভক্তের প্রতীক; কৃষ্ণ ভগবান। ভক্ত যেমন ভগবানের পায়ে নিজেকে সঁপে দিতে চান তেমনই ভগবানও ভক্তের সঙ্গে মিলনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় উচাটন হয়ে থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ কৃষ্ণের মুখে শোনা যায়–

"ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।।
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।।

... ...

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি।।
আপনারে বড় মানে – আমারে সম হীন।
সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন।।"[৭]

ধর্মতত্ত্বের কথা যাই-ই হোক, আমরা যদি একে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি, তাহলেও রসাস্বাদনে কোন অসুবিধা হয় না। যিনি দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য রাজদণ্ড হাতে নেন, তিনি তো সাধারণ মানুষের জীবন-পরিবেশ থেকেই উঠে আসেন। তিনি কখনই ভুলতে পারেন না জীবনের মধুরলীলার সেইসব পর্যায়, সেইসব সম্পর্কগুলিকে। কিন্তু বর্তমান কালের দুর্ভাগ্য! অতি-রাজনীতিকতা দেশের দণ্ডধারীদের রাজমুকুটলোভী করে তুলছে, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন 'ময়ূরপুচ্ছের মূল্য', তাঁরা 'বৃন্দা'-র মতো দূতীদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন কি? রাখাল কৃষ্ণ সম্পর্কে মামা অসুর কংসকে হত্যা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বর্তমানকালে স্বজনপোষণের রাজনীতি চলছে, নীতির কোন বালাই নেই। তাই দিকে দিকে

হিংস্র নরখাদকদের নখদন্তের শিকার হচ্ছে নারী, শিশু ও অসহায় মানুষ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিকে বিকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এর মূলে রয়েছে মনে হয় ধর্মহীন জীবনচর্যার অনিবার্যতা। একারণেই হয়তো বিংশ শতাব্দীর কবিকে লিখতে হয়–

"নাই ভগবান, নাইকো ধর্ম, যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে।"[৮]

বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে 'রাখালের রাজগি'-কে পড়তে চাওয়ার একটা মদত লেখকের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। লেখক এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন, মহারাজা শ্রীযুক্ত স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে। উৎসর্গপত্রে লেখেন–

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কোন দিন যিনি ব্রজের রাখালী ক'রতেন, বাঁশীর সুরে মন ভোলাতেন, তিনি পরে মথুরায় গিয়ে একচ্ছত্র রাজা হোয়েছিলেন। আমরা তাঁর মথুরার স্বর্ণসিংহাসনের রেণু দেখে মুগ্ধ হই নি। বৃন্দাবনে যে তাঁর চরণরেণু পড়ে আছে, তাই তিলক ক'রে গৌরব ক'রে থাকি। তিনি মথুরায় রাজদণ্ড দিয়ে দুষ্টকে শাসন ক'রতেন, আশ্রিতকে রক্ষা ক'রতেন, কিন্তু তাঁর মনটা পড়েছিল, যমুনার তীরে মাধবীকুঞ্জের তলায়। সেখান থেকে তিনি তাঁকে কে কি রকম ভালবাসে, তা দেখ্‌বার জন্য দুটি চোখ পথের দিকে ফেলে রাখ্‌তেন।

মহারাজ, আপনি রাজত্ব লাভ করেছেন, কিন্তু এক সময়ে আপনিও সাধারণের একজন ছিলেন এবং সকলের সঙ্গে মিশে তাদের বন্ধুত্বের অভিমান ক'রতেন। আপনি ঐশ্বর্যের রাজতক্তায় ব'সে সেই প্রীতির ক্ষেত্র ভোলেন নি। আপনার সুকুমার ভাবগুলি ধনরত্নের নীচে চাপা পড়েনি, বরং আরও বিকাশ পেয়েছে। রাজশক্তির পাশ কাটিয়ে আপনি হৃদয়কে বড় রেখেছেন; - মাধুর্য্যকে ঐশ্বর্য্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন ক'রেছেন। এই কারণে

"রাখালের রাজগি"

আপনার কর-কমলে সবহুমানে অর্পণ কর্‌লাম।"[৯]

এই পত্রে লেখক কৃষ্ণকে সমকালের প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। সেই সাহসেই আমরা বর্তমান কালের নিরিখে পাঠের সাহস দেখিয়েছি। বর্তমানকালে ঐশ্বর্যের দাপট চরম আকার ধারণ করছে। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জনসাধারণকে নানান ছলনায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা-চরিত্র করে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে হয় শাসকদের হৃদয়ের 'সুকুমার ভাবগুলি ধনরত্নের নীচে চাপা' পড়ে গেছে। এখন দরকার সেই বাঁশীটিকে খুঁজে বের করা, খুঁজে বের করা সেই প্রেমপাগল রাখালটিকে।

পাঁচ...

এখন আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ। শিক্ষিত, ভদ্র, সভ্য। আমরা জানি ভাষা মানুষে মানুষে যোগাযোগের মাধ্যম। জানি, স্থানভেদে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ, ব্যবহারিক আদব-কায়দা। তবু, আমরা কেউ কেউ প্রধান শহর বা রাজধানীতে বাস করার দৌলতে শিক্ষার বড়াই করি। হেয় জ্ঞান করি আঞ্চলিক ভাষায় কাউকে কথা বলতে শুনলে, বা শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও কারও মুখ থেকে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হলে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন আজ থেকে প্রায় শতাধিক বছর আগে গ্রামবাংলার মুখের ভাষাকে যে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় 'মুক্তাচুরি' ও 'রাখালের রাজগি' পাঠ করলে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই গ্রাম-এলাকার বাংলা-ভাষী মানুষের একেবারে মুখের ভাষাভঙ্গিটি ধরা পড়বে–

১. "ওরই পরামর্শে তো রাই সব কাজ ক'রে থাকে! ওই সখীটাই রাইএর মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।"[১০]

২. "রাখালেরা আমোদ কচ্ছে? সে কিসের আমোদ? সে আমোদে নাকি কানু উঠে-পড়ে লেগেছে? আমায় ছেড়ে তার কিসের আমোদ? আমি রাগ করেছি শুন্‌লে ত কেঁদে ভাসিয়ে দেবার কথা! - সে কি ক'রে আমোদ কর্ত্তে পারে? অসম্ভব।"[১১]

৩. "রঙ্গদেবী বললেন, 'এই যে গোবর্দ্ধন-গিরি, শিলা-তল বড় নির্জন স্থান; মথুরা যাবার চার দিন আগে এইখানে দুপুরবেলা রাইকে পেয়ে কত সুখী যে হোয়েছিলেন তা আর কি বলব। রাই এই পীত-বাস পরে মনে হয় তোমার বর্ণ দিয়ে আমার গা ঢেকে ফেলেছি, - তোমার নামে সাধা বাঁশী, তাই এক দণ্ড আমি হাতছাড়া করতে পারি না। দিন রাত তোমার পায়ের ধূলি পাবার গরবে আমার মাথার চূড়া হেলে থাকে।'

এই বলে কত আদরে রাধার পা ছুঁতে গেলেন। 'কি কর' বলে রাই পা সরিয়ে নিচ্ছেন, - আর কানু বল্‌ছেন – 'ঐ পা ছুঁলে মনে হয় যেন আমি জীবন পাচ্ছি।'

সেই মানুষ কি হয়ে গেল।"[১২]

৪. "রাইয়ের অবস্থা কি বল্‌বো। যেদিন আমি আস্‌ব, তার আগের দিন দেখি, রাই শুয়ে আছে, ওঠ্‌বার বল নেই, দিন রাত মুখে 'কানু' 'কানু' 'কানু' । ক্ষীণ কণ্ঠে আমায় বল্লে, - 'দূতি তার দোষ নেই, আমার ভাগ্যের দোষ। এ কি কেউ বিশ্বাস করবে? দূতি, আমি নদীর মোহনায় এসে তৃষ্ণায় ম'রে গেলেম! শ্রাবণ মাসের মেঘ আমায় এক ফোঁটা জল দিলে না, কে বিশ্বাস করবে? দূতি, চন্দন গাছ আমাকে দেখে সুগন্ধি লুকিয়ে রাখ্‌ল; কানুকে ভালবেসে আমার এই হবে তা কে জান্‌তো? এ আমার ভাগ্যের দোষ।'"[১৩]

এই চারটি উদাহরণে (১) রাগ প্রকাশের ভাষা, (২) মান-অভিমানের ভাষা, (৩) বর্ণনা ও তির্যকতার ভাষা, (৪) বেদনাবিধুর আক্ষেপের ভাষা– আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিটি ভাবের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তা খুব অনায়াস দক্ষতায় সার্থক শিল্পরূপ দান করেছেন দীনেশচন্দ্র। তাঁর প্রবন্ধের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার পার্থক্য যে কতখানি সেটিও কম আশ্চর্যের নয়। উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যাক, 'বঙ্গে ভক্তি' থেকে কয়েকটি ছত্র –

> "বঙ্গদেশের মত এমন পুষ্পাভরণালঙ্কৃতা, কুন্দ-কুটজ-চম্পক-অনুরঞ্জিত দেশ কোথায়? প্রেম-কণ্ঠে এদেশীয়ের মত কে গাইতে পারে? নবরসের সেতারে এ দেশের মত কে এত মধুর ঝঙ্কার দিতে পারে? বীণাধ্বনি এত মধুর কোথায়? বঙ্গভাষার ন্যায় ললিত পদবিন্যাস কোন্ ভাষায়? বীরের ভ্রূকুটি দ্রুমের উচ্চতা, কৃষ্ণমেঘোপম নগের শৃঙ্গ – না দেখিলে, প্রশংসা করিবে না, তুমি যদি এরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে বঙ্গদেশের শোভা ধারণা করা তোমার অদৃষ্টে নাই, তুমি বিদায় হও।"[১৪]

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত আলোচ্য দুটি গ্রন্থে তিনি বিশেষ ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। যে ভাষায় মানুষ কথা বলে, ভাব প্রকাশ করে সেই ভাষার প্রতি, সেই ভঙ্গির প্রতি ভক্তি দেখানো হয়েছে। আজকের দিনেও এই ব্যাপারটি শিক্ষণীয়।

ছয়...

গ্রাম ও শহরজীবনের পার্থক্যটিও উপলব্ধ হয় এই দুটি রচনায়। গ্রামজীবনের ছেলেপিলেদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যে কি বিচিত্র হতে পারে তার জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় *'মুক্তাচুরি'*-তে:

> "রাখালদের ভারি স্ফূর্ত্তি হোল। কেউ বাছুরের লেজ ধরে দৌড়তে লাগ্‌ল; কেউ একটা ডুরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাঘের মত থাবা পেতে ব'সে গরুকে ভয় দেখাতে লাগ্‌ল; কেউ বেঙ্গের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুট্‌ল; কেউ বা উড়ন্ত পাখীর ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যেতে লাগ্‌ল;

> কেউ বা কোকিলের ডাক ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল্ল; কেউ দাঁত বার করে বানরগুলোকে ভেঙ্গ্‌চাতে লাগ্‌ল; কয়েকজন মিলে গেড়ু খেলতে সুরু করে দিল; কেউ শিবঠাকুর সেজে শিঙ্গায় ফুঁ দিলে; কেউ বা বালুর উপর পাখীর পদচিহ্ন ধোরে ধোরে যেতে লাগ্‌ল; কেউ বা চোখ বুজে অন্ধ সেজে হাতড়াতে হাতড়াতে চল্ল; কেউ বা এক-ঠেঙ্গো সেজে লাফাতে লাফাতে চল্ল; কেউ বা সাদা উড়ুনী দিয়ে গা ঢেকে যমুনার পারে বকদের মধ্যে গিয়ে বক হয়ে বসে রইল।"[১৫]

বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগেও গ্রামজীবনে এরকম দৃশ্যগুলি অভাবনীয় ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে, বিজ্ঞাপনসর্বস্বতার যুগে, কৃত্রিম চটকদারিতার যুগে গ্রামগুলির মৌলিক চরিত্র অনেক বদলে গেছে, দিনে দিনে আরও যাচ্ছে। আর বদলে যাওয়ার এই গতিকে সবচেয়ে বেশি ত্বরান্বিত করছে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। রাজনীতির অতিরিক্ত দখলদারিতে শিক্ষাব্যবস্থায় ঘনঘন পরীক্ষামূলকতার চাপে শিশু-কিশোররা পরিণত হচ্ছে গিনিপিগে। তাদের শৈশব-কৈশোর হয়ে যাচ্ছে ধূসর পাতায় আবদ্ধ। দিলখোলা আনন্দের জগতই যাচ্ছে হারিয়ে। তাই এখনকার অনেকের কাছেই কৃষ্ণের সখাদের ঐ আচরণগুলি অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যে সরলতা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, পশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব – আর এসবের মধ্যেই রয়েছে মানবিকতার পাঠ, তা ভুললে চলবে না।

বৃন্দার চোখে *'রাখালের রাজগি'*-তে শহরজীবনের নেতিবাচক দিকগুলি উঠে এসেছে।

> "এ ত বৃন্দাবন নয়,- এ যে মথুরা। এখানে বড় বড় অট্টালিকা, - একটা ফুল বা লতাও ত পাওয়া যাচ্ছে না। নগরের বুক পাষাণে চাপা। এখানে প্রভাতে পদ্ম ফুটে ওঠে না। বড় বড় বাড়ীর আড়াল থেকে সূর্য্যোদয় দেখা যায় না। পাখী কলরব করে না। শেষ রাত্রে 'দয়েল', 'চোখ গেল' ডেকে ওঠে না; রাত্রি যে পুহিয়ে যায় – তা বুঝব কি করে? ... কই রাখালদের বাঁশীর সুর কই? মায়েরা ছেলেদের চোখে কাজল পরান্ কই? কপালে অলকা তিলকা এঁকে দেন কই? বউএরা কলসী নিয়ে নুপুর বাজিয়ে জল আন্‌তে যান কই? পুকুরের জলে পদ্মের মত সুন্দর মুখ ফুটে ওঠে কই? কোমল হাতের চুড়ি-বালায় লেগে বাসনের ঠুন্ ঠুন্ শব্দ ঘাটে ঘাটে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে কই? মেঠো সুরে আকাশ কাঁপিয়ে চাষী হাল বায় কই?"[১৬]

বৃন্দার চোখে দেখা এই গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যগুলি আজকের গ্রামগুলিতে আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? এর সম্ভাব্য উত্তর– অনেকাংশেই হয়তো 'না'। শুধু তাই-ই নয় গ্রামের মানুষ বেনিয়ান-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অনেক বদলে গেছে। এক বৃদ্ধ যেমন বৃন্দাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল গ্রামের মেয়ে হিসেবে, আজকের গ্রামের ছেলেমেয়েদের সেইভাবে চেনা প্রায় অসম্ভব। আজকের গ্রামের ছেলেমেয়েদের রাস্তা বলে দিয়ে অত সহজে কেউ টাকা চাইবার সুযোগ পাবে না। আসলে বর্তমান কালে শহর কি গ্রাম সব জায়গা থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে সরলতা। 'অক্রুর'-রা অতি-সচেতন, অতি-বাস্তববাদী করে তুলছেন ছেলেমেয়েদের। ফলত আজকের দিনে যেন না আছে রাখাল, না আছে বাঁশী, না আছে রাধা-বোলে-বাঁধা বাঁশীর সুর। আজ আর কেউ মুক্তাও দিতে চায় না, মুক্তা ফলাতেও জানে না। জানে শুধু শাসন করতে, 'রাজগি' পাওয়ার কৌশল আঁটতে। দীনেশচন্দ্র কি এর আগাম আভাস পেয়েছিলেন? কৃষ্ণের মুখে সেইজন্যে কি শুনতে পাই–

> "কংসের ধ্বংসের পর থেকে জগৎ জুড়ে প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের পূজা হোচ্ছে। বাঁশীর সুর বধির জগতের কানে এখন পৌঁছাবে না; তাই বাঁশী এ যুগে আর বাজ্‌বে না।"[১৭]

কিন্তু হতাশার কালো অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত কর্তব্য নয়। তাই কৃষ্ণকে এও বলতে শুনি–

> "... তোমরা বাঁশী শুনেছ, তোমরা সে সুর ভুলবে না; তোমরা দুঃখের মর্ম্ম বুঝেছ, তোমরা আমায় ভুলবে না। আমি তোমাদের পদাঙ্ক দেখে দেখে এ যুগ কাটিয়ে দেবো। তোমরা আমার বাঁশী শোনবার জন্য কান একাগ্র করে থেকো।
>
> এর পরের যুগে রাধা আর আমি এক হোয়ে যাব।"[১৮]

কৃষ্ণ কথা রেখেছিলেন - বৈষ্ণববিশ্বাসে। তাই কৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-চৈতন্য প্রেমের বন্যায় সব পাপ-অপশাসন-অন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিলেন। আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ সেই বাঁশীর জন্য কান পেতে আছি। আমরা কি মুক্তা পাবো না? আমরা কি 'রাজগি'-র মোহ থেকে বেরিয়ে আসা কালের রাখালের দেখা পাবো না? যে আশা বুকে নিয়ে কালোত্তরের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন:

"আমি হব না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননীছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।"[১৯]

সেই ভাবের ঘোরেই যেন দীনেশচন্দ্র সেন স্বদেশীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে পৌঁছাতে চেয়েছেন 'রাখালের রাজগি' ও 'মুক্তাচুরি' রচনার মাধ্যমে। কালের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে, হাড়ে হাড়ে অনুভব করেই ঐশ্বর্যরূপের পরিবর্তে চিরন্তন প্রেমের দেবতা কৃষ্ণের রাগানুগা কথাকে তিনি আধুনিক সমাজের ঝাঁ-চকচকে আলোচনাসভায় অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব ব্যক্তিত্বের রসে জারিত করে, দেশীয় ভাষা ও ভঙ্গিসহযোগে। সেক্ষেত্রে, শহুরে চটকদারি ও উপরচালাকিসর্বস্ব বাহাদুরির কাছে এতটুকু দ্বিধা ও কুণ্ঠা তিনি অনুভব করেননি।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র দাস গুপ্ত, গুপ্ত এন্ড কোং, ৪৯, রসারোড ভবানীপুর, কলকাতা, চৈত্র, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, অবতরণিকা।
২. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস গুপ্ত, গুপ্ত এন্ড কোং, ৪৯, রসারোড ভবানীপুর, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, পরিশিষ্ট অংশ, পৃ. ১২।
৩. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। প্রাগুক্ত, অবতরণিকা।
৪. তদেব।
৫. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, অবতরণিকা।
৬. তদেব, পৃ. ৬৭।

৭. গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। পঞ্চম সংস্করণ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১০, পৃ. ৫১-৫২।

৮.http://www.milansagar.com/kobi/jatindramohan_bagchi/kobi-jatindramohanbagchi_kobita4.html

৯. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, উৎসর্গপত্র।

১০. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। প্রাগুক্ত, অবতরণিকা, পৃ. ২৭।

১১. তদেব, পৃ. ২৯।

১২. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৩. তদেব, পৃ. ৭০।

১৪. সেন, দীনেশচন্দ্র। রেখা। শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, 'বঙ্গে ভক্তি' প্রবন্ধ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪২।

১৫. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮।

১৬. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১৭. তদেব, পৃ. ৭৬।

১৮. তদেব, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৯. https://www.tagoreweb.in/Verses/khanika-42/jonmantor-514#google_vignette